

বার্ষিক সাধারণ সভায় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের বার্ষিক সাধারণ সভার (২০১৮-২০১৯) আয়োজন করা হয়েছিল গত ১০ নভেম্বর ২০১৯। এই সভা অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ শহরের নেতাজী আবাসে। সভার শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমন্দা সরকার।

সভা পরিচালনার জন্য যৌথ দায়িত্ব দেওয়া হয় সমর

বরণ মাল্লা এবং প্রদীপ মুখার্জীকে। এই প্রস্তাব সকলে সম্মিলিতভাবে সমর্থন করেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা সকল জেলার প্রতিনিধি এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বাগত জানান। স্বাগত ভাষণে তিনি বলেন ১৯৯৬ সাল থেকে এই নেটওয়ার্ক শিশুদের শিক্ষার অধিকারের দাবিতে কাজ করে

আসছে। তিনি এই সভার আয়োজন ও সহযোগিতা করার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক, প্রতীক চৌধুরী, বাপু এবং সংলাপকে ধন্যবাদ জানান। সমাজ ও পরিবারের সামগ্রিক বিকাশে নারীর ভূমিকা এবং নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সমাজজ্ঞা

নভেম্বর ২০১৯-ফেব্রুয়ারি ২০২০

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র



আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে

তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত



সংলাপের সম্পাদক তপতী ভৌমিক 'শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক আলোচনায় বলেন, নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার জন্য মালালা ইউসুফজাই-এর লড়াই এবং তার নোবেল প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেন।

রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, বিদ্যালয় ছুট শিশু, শিশু শ্রমিক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অধিকার, ভাল সরকারি বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয় জল,

কার্যকরী শৌচালয় ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করেন। সমাজসেবী দিন মহম্মদ মণ্ডল ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবিতে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষক অসীম অধিকারী বাল্যবিবাহের সমস্যা, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, ছেলেদের পড়ার হার কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিদ্যালয় ছুট বন্ধ করতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শিশুর উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষক-ছাত্র মানবিক সম্পর্ক, বিদ্যালয়ে খেলাধুলার ব্যবস্থা ইত্যাদির গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জেলা আহ্বায়ক দিলীপ পাল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রামস্তরে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক কাজ, সংসদ সভায় শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয় আলোচনার ওপর গুরুত্ব দেন।

ওয়েবিনার রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য অরূপ ২ পাতায় শেষাংশ



বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ



বক্তব্য রাখছেন রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডা

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

হিংসা ও শৈশব

দেশের রাজধানীতে ঘৃণা ও হিংসার প্রদর্শন, বহু মানুষের মৃত্যু, স্বজন হারাবার হাহাকারের জন্য যারা দায়ী তাদের কাছে শিশুর মনস্তত্ত্ব, শৈশব, শিশুর বিকাশ এসব কথা বলে কোনও কাজ হবে বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। যে কোনও সুস্থ মানুষই বুঝতে পারেন, এই ধরনের হিংসা শিশু মনে কী গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। যে শিশু তার প্রিয়জনকে হারালো, বা যে শিশু চোখের সামনে এই হিংসা ঘটতে দেখল, ভবিষ্যতে তার মনে এর কী কী প্রভাব ঘটতে পারে সে বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদরা ভাল বলতে পারবেন। আমরা সাধারণ মানুষ এইটুকু বুঝতে পারি এই শিশুরা তাদের শৈশব হারালো। এমনিতেই পণ্যমোহগ্রস্ত, চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক এই সমাজে অভিভাবকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে শিশুরা শৈশব হারাচ্ছে। অপুষ্টি, রক্তাক্ততা কত শিশুর প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে প্রতিদিন। এও এক ধরনের হিংসা। তারপর এই ধরনের ঘৃণা ও হিংসা শিশু মনে যে প্রভাব ফেলবে, আমাদের ভবিষ্যৎ পৃথিবী কোনদিকে এগোবে তা ভাবতে গেলে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের দেশ বলেই নয়, পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে হিংসার ঘটনায় সাধারণভাবে যুক্ত থাকে স্বার্থাশ্রয়ী কিছু মানুষ। আবার একথাও ঠিক বহু ক্ষেত্রে এই স্বার্থাশ্রয়ী মানুষেরা মিথ্যা প্রচারে অনেক সাধারণ মানুষের সমর্থনও আদায় করে নিতে সফল হয়।

তাহলে আমাদের দায়িত্ব কী? আমাদের সংবিধানের ৫১ এ অনুচ্ছেদে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে নানা কথা বলা হয়েছে। দেশের জনগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন, বৈচিত্রকে রক্ষা করা, বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ, মানবতা এবং অনুসন্ধানী মনোভাবের বিকাশ এবং সংস্কার — প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

আমরা নিজেরা যদি আমাদের জীবনচর্যা প্রতিদিন এই দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে পারি, তাহলে শিশুরাও আমাদের দেখেই এই দায়িত্ব ও কর্তব্য শিখে নেবে। সহমর্মিতা, প্রতিটি মানুষকে শ্রদ্ধা, অনুসন্ধানী মন, বিজ্ঞানমনস্কতা আমাদের সমাজকে বুঝতে যেমন সাহায্য করে, মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমাদেরকে ‘মানুষ’ হিসেবেও গড়ে তোলে।

পরিবার থেকে বিদ্যালয়, সমাজ সর্বত্রই আমাদের এই দায়িত্ব পালন করা যেতে হবে। দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হলে এই হিংসার দায় আমাদের ওপরেও বর্তাবে। আমরা তা অস্বীকার করতে পারব না। আমাদের সংস্কৃতি বহুত্বকেই স্বীকৃতি দেয়। এখানেই উচ্চারিত হয়েছে, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই।

আমাদের পুকুর

প্রদীপ চক্রবর্তী

আমাদের বাড়ির কাছে একটা পুকুর আছে। আশেপাশের সবাই ঐ পুকুরে চান করে, ওখান থেকে জল তুলে গরু-ছাগল চান করায়। কাপড় কাচাও হয়।

পুকুরের এক কোণে কচুরি পানা জমে। মাঝে মাঝে বাবা, কানাই কাকা, ভবাদা’রা পানা তুলে ফেলে। কিন্তু আবার কচুরিপানা হয়ে যায়। কচুরিপানার নীচে ওদের শিকড় দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ছোট বড় মাছ সেগুলো ঠুকরে ঠুকরে খায়। আমার দাদা আর ওর দুই বন্ধুরা ব্যাঙদের দিকে তাক করে ঢিল ছোঁড়ে, ব্যাঙগুলো তখন কচুরিপানার তলায় গিয়ে লুকোয়। বেশ করে। দাদারা খুব খারাপ।

মা বলে কাউকে মারতে নেই।

ভবাদা’র বাবা বিকেলে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসেন। পুকুরের এক কোণে হেলে পড়া খেজুর গাছটার পাশে। কোন কোন দিন বড় মাছ ধরা পড়ে। ভবা’না গিয়ে সব বাড়িতে দিয়ে যায়।

পুকুরের আর এক কোণে কলমি লতা ভাসে। আমার কলমি শাক ভালো লাগে। চান করে ফেরার পথে মা অনেক দিন কলমি শাক নিয়ে আসে।

মা’র সঙ্গে আমিও চান করতে যাই। ভুলুও লেজ নাড়তে নাড়তে যায় আমাদের সঙ্গে। মা আমায় চান করিয়ে দেয়। ভুলু নিজে নিজে চান করতে পারে। সাঁতারও কাটে। আমি পারিনা। মা বলে আর একটু বড় হও শিখিয়ে দেবো। আমার চান হয়ে গেলে মা ভুলুকে বলে -

যা ভুলু বুনকে পাহারা দে। আমি ঘাটের পাশে বাবলা গাছটার ছায়ায় বসে থাকি, ভুলু পাহারা দেয়। পাড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন ঘেউ ঘেউ করে ভুলু আমায় ডাকে। দেখি একটা সাপ একটা ব্যাংকে মুখে পুরে তাকে গেলার চেষ্টা করছে। সাপের মুখ থেকে বেরিয়ে থাকা ব্যাঙের দুটো পা তখনও নড়ছে।

ভুলু ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে। আমি কেঁদে ফেললাম। ততক্ষণে মা ঘাট থেকে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে। বললো - বোকা মেয়ে, এতে কান্নার কি আছে। তুমি যখন মাছ খাও তখন কি আর কেউ কাঁদে?

সেদিন ঘাটে থেকে ফেরার সময় মা আমাকে অনেক কথা বলেছিলো। কিছু বুঝেছিলাম, অনেক কিছু বুঝিনি। আমি শুধু একটা কথা বুঝেছিলাম - পুকুরটা একা আমাদেরই নয়।



প্রথম পাতার শেষাংশ

দাস যোগাযোগ বৃদ্ধি, সহায়ক ভূমিকা পালন করা, বিদ্যালয় কেন্দ্রিক কাজ এবং ব্যক্তি অনুযায়ী ভূমিকা ও দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা বলেন।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক তপন কুমার মণ্ডল বলেন, বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতি জেলার সাংগঠনিক পরিস্থিতি বিষয়ে লেখা এবং প্রতিবেদন আরও বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

সদস্যদের মতামত এবং বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিবাচক বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠনের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ, কার্যকরী গ্রামস্তরীয় শিশু সুরক্ষা কমিটি, বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষা জেলাস্তরে নিয়মিত সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সব জেলার সদস্য তালিকা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের মধ্যে রাজ্য কার্যালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী বছর বিশেষভাবে উদযাপন করার

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সব জেলার ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে উদযাপন কমিটি গঠন করা হয় এবং এই উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে রাজ্য আহ্বায়ক স্বপন পণ্ডার নাম প্রস্তাব ও গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী ২০২০ সালের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৫ বছর উদযাপন অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই ২৫ বছরের যাত্রাপথে যে সকল সাথী ওয়েবের সাথে যুক্ত হয়েছে, তাঁদের সকলকে এই উদযাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সমগ্র সভা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ডেইসি বেগম। সভাপতি সমর বরগা মাল্লা সভার আলোচিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলা থেকে সম্মেলনে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শিশু অধিকার দিবস

প্রতি বছরের মতো এবছরও পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস। গত ২০ নভেম্বর, ২০২০ কলকাতার মোহরকুঞ্জে এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সাতশোর অধিক শিশু উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রত্যেক শিশুকে শিশু সুরক্ষা আয়োগের পক্ষ থেকে নানা উপহার দেওয়া হয়। রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা



বক্তব্য রাখছেন শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী

আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানিয়ে শিশু অধিকার দিবস পালনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা শিশুদের সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি কন্যাশ্রী প্রকল্পের গুরুত্ব এবং সাফল্য বিষয়ে আলোকপাত করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে যে সকল শিশুরা শিশু সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাঁদের বীরাজনা ও বীরপুরুষ পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রাপক শিশুরা হল জবা দাস, আয়েশা খাতুন, শুভজিত মল্লিক, অঞ্জলী দাস, সাথী মণ্ডল, সাবিনা ইয়াসমিনা গায়েন, মঞ্জুরী হালদার, মাফুজা শেখ, ওয়াসিম হালদার, মিয়াজ হালদার, বৃষ্টি সরদার, আফসানা খাতুন, কুসুম মিস্ত্রী, মঙ্গলা বরাট, রেজোনা খাতুন, তাহাজুল ইসলাম, অলোকেশ পণ্ডা, রীমা বেড়া, গৌরি জানা, সরোজ থাপা, অনিমেয় মণ্ডল, সৌরভ রাই, বিশ্বনাথ বাউরী, মোহিত বাউরী, পারমিতা ভট্টাচার্য। যে সকল সাংবাদিক ও পুলিশ আধিকারিক শিশু অধিকার সুরক্ষায় অবদান রেখেছেন, তাঁদেরকেও এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। এদিন শিশুরা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চের দুই পাশে শিশু অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনের স্টল ছিল। ছিল শিশুদের পছন্দের নানা খাবার, ছবি আঁকার ব্যবস্থা।

ওয়েবেনের স্টল

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস পালন উপলক্ষে ২০ নভেম্বর, ২০২০ কলকাতার মোহরকুঞ্জে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সেখানে শিশু অধিকার নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্টল ছিল। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে একটি স্টল দেওয়া হয়। নেটওয়ার্ক প্রকাশিত শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন পোস্টার দিয়ে স্টল সাজানো হয়। স্টল থেকে সমপথ, শিশু অধিকার নিয়ে বই এবং পোস্টার বিতরণ ও বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা স্টল পরিদর্শন করেন। তাঁর হাতে ওয়েবেন প্রকাশিত শিশু অধিকার নিয়ে বই, সমপথ এবং পোস্টার তুলে দেওয়া হয়।

বই মেলায় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের স্টল

প্রতি বছরের মতো এবছরও পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের পক্ষ থেকে কলকাতার আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় স্টল দেওয়া হয়। প্রতিদিন শিশুদের জন্য গল্প, ছবি আঁকা, অভিনয় সহ নানা কিছু শেখা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা হুগ্লোড এবং শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা এই স্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই স্টলে বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট ব্যক্তির আসেছেন। নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা, শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী, আয়োগের সচিব সুদীপ্তা চ্যাটার্জী এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য এবং শিশু সুরক্ষা নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।



বইমেলায় শিশু সুরক্ষা আয়োগের স্টল

শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা

বিদ্যালয়ের আঙিনায় নানা সময়ে শিশুদের সুরক্ষা বিদ্যমান হয়। এই জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা আইন ও নির্দেশিকা জারি হলেও শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয়ে যৌন নির্যাতন থেকে শিশুর সুরক্ষায় নির্দেশিকা প্রকাশ করে গত ২৬ জুন, ২০১৯ তারিখে। অভিভাবকদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে স্বরূপনগর ব্লকের চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা, শিশু অধিকার ও সুরক্ষা এবং শিশু বাস্কব বিদ্যালয় গড়ে তুলতে অভিভাবক এবং গ্রামবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ



শিশু অধিকার দিবসে ওয়েবেনের স্টল

সংগঠন সংবাদ

ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। নবাতকটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা আহ্বায়ক এবং রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য দিলীপ পাল এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিয়াউল মোল্লা। বালতি পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বিহারী পবনকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সাথে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে একই বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করা হয় কালিদহরপোতা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন দিলীপ পাল, প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যথাক্রমে গোলাম রসুল, আশরাফ হোসেন এবং মাফিজুল ইসলাম ও ওয়েবেনের রাজ্য সঞ্চালক চিরঞ্জন পাল। প্রতিটি আলোচনা সভাতেই অভিভাবকদের বিশেষ করে মায়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিদ্যালয়কে শিশুবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে ইতিবাচক ভূমিকা নেবে।



শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনায় অভিভাবক

পকসো নিয়ে শিশু সুরক্ষা আয়োগের আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে এবং ডিরেক্টরেট অফ চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ট্র্যাফিকিং-এর সহায়তায় পকসো আইন নিয়ে একদিনের আন্তঃরাজ্য আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল কলকাতার আই সি সি আর-এর সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে আয়োজিত এই



পকসো আইন নিয়ে আলোচনায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা



শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনায় অভিভাবক

আলোচনাসভায় সকলকে স্বাগত জানান পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী। এই দিনের আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন দিল্লি, হরিয়ানা, গুজরাত, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ এবং কর্ণাটকের শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্যরা। কর্ণাটক শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য পরশুরাম এম এল বলেন, যে সমস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ষোড়শী কিশোরীদের বিবাহ প্রচলিত। সেই অঞ্চলে পকসো আইন কার্যকর করতে দেখা গেছে, একজনকে বাঁচাতে গিয়ে সমগ্র পরিবার এবং সমাজকে অপরাধী বিবেচনা করা হচ্ছে। তাই ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও প্রথাসিদ্ধ আইনকে মাথায় রেখে এই আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। বয়ঃ সন্ধিতে তৈরি হওয়া যৌন সম্পর্কে পকসো আইনের আওতায় না আনার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। শিশুর ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে মানসিক আঘাতের সমস্যা দূর করতে কাউন্সেলিং-এর ওপর জোর দেওয়ার কথাও উঠে আসে এই আলোচনায়। বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং, দ্রুত নিষ্পত্তি, ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শিশু সুরক্ষা আয়োগের সদস্য ছাড়াও পুলিশ আধিকারিক, বিচারক, আইনজীবী, পাবলিক প্রসিকিউটর, সমাজকর্মীরা এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন ও মতামত দেন। পকসো আইনটি সংশোধনের জন্য মোট ২১টি সুপারিশের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সুপারিশগুলি জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ, সুপ্রিম কোর্টের জুভেনাইল জাস্টিস কমিটি এবং ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি-র কাছে পাঠানো হবে।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ক আলোচনা

রামনগর-২ ব্লকের অন্তর্গত কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েত, VLCPC-র সদস্য-সদস্যা ও এলাকার অভিভাবক-অভিভাবিকাদের নিয়ে আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৪৫ জন। মায়েদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য, উপস্থিত ছিলেন গ্রাম প্রধান সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য-সদস্যবৃন্দ। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য অনুরাধা মণ্ডল ও ব্লক আহ্বায়ক সোমা দাস। বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয় কমিটির কাজ, সদস্যদের ভূমিকা ও এলাকার মানুষের সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা হয়। আগামীদিনে এই শিশু সুরক্ষা নিয়ে প্রতি মাসে সভা হবে। ৩ মাস অন্তর Report ব্লকে পাঠানো হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের তালিকা করে ব্লকে পাঠাবেন। প্রধান মহাশয় সমাপ্তি ঘোষণার সময় সচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্ব নিয়ে কাজে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন।

প্রতিবেদক : সমরবরণ মান্না

অক্ষয়কুমার দত্তের মতাদর্শ

সমরবরণ মাস্তা

বাংলাদেশে উনিশ শতকে অক্ষয় কুমার দত্ত অভিনন্দিত হয়েছেন এক চিরকালীন আধুনিক ও বিজ্ঞান-মনস্ক মনীষী হিসাবে। সত্যিই বিজ্ঞানমনস্কতা অক্ষয় চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই বিজ্ঞানমনস্কতা অক্ষয় কুমারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আধুনিকতার উৎস সন্ধান, একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজে কি রকমের আমূল পরিবর্তন আনতে পারে-বিপুল ধনোৎপাদনে সাহায্য করতে পারে, উন্নততর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন করতে পারে, প্রকৃত সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে, তা তিনি শিখেছিলেন আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস থেকে। ইউরোপের উন্নতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞান-তাড়িত শিল্প বিপ্লব-এই উপলব্ধি তাঁর মনে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ বপন করেছিল, তাঁর কাছে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদ ছিল একই চিন্তার এপিঠ-ওপিঠ।

অক্ষয় কুমারের জীবনদৃষ্টির প্রসারতা প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর দ্বারা উত্থাপিত কিছু সমাজ-সংস্কার মূলক প্রস্তাবে, যা তখনকার দিনে ছিল অকল্পনীয়, যেমন তিনি স্বাধীন বিবাহের পক্ষে মত জ্ঞাপন করেন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার সমর্থন করেন, এমনকি সেই যুগে দাঁড়িয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন, বিস্মৃত-প্রায় এই মনীষীকে ইতিহাসে তাঁর যোগ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

অক্ষয় দত্তের মতাদর্শের বিচারে তাঁর ক্রমিক বিকাশের ধারাটি আমাদের আলোচনাতেও এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি।

মানুষের জ্ঞানচর্চার অদ্বিতীয় সার্থকতা ও অতুলনীয়তার বোধই অক্ষয় দত্তের বিশ্বদৃষ্টি তথা জীবন রোধের সর্বপ্রধান উপাদান, তাঁর সামাজিক মতাদর্শের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের কর্তব্য, প্রথম ও দ্বিতীয় কর্তব্য হিসাবে স্থান পেয়েছে জ্ঞানোপার্জন ও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা, জ্ঞান ব্যতীত শারীরিক নিয়ম জানা সম্ভব নয় এবং নিয়ম জানা না থাকলে বা পালন করাও অসম্ভব। অতএব এক্ষেত্রেও জ্ঞানোপার্জনের সন্ধান সর্বাপেক্ষে।

এরপর তৃতীয় কর্তব্য হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে ধর্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন, মানবিক মনোবৃত্তির বিষয়ে প্রসঙ্গত তাঁর ত্রিমুখী বিভাজন উল্লেখ করতে হয়, কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর আশ্চর্য বাস্তব সচেতনতা ও কাণ্ডজ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে যা হিন্দু-ভারতীয় চিন্তায় কচ্চিত দৃষ্টিগোচর হয়, তিনি বলেছেন ‘মনুষ্য, সকল অবস্থাতেই সন্তোষজনক স্পর্শমনি দ্বারা সুখ-স্বরূপ স্বর্ণলাভে সমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও সে দুঃখ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে’ এমত নহে”।

‘অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থা’ বলতে তিনি কি বোঝেন তার উদাহরণ হিসাবে ১) অত্যাভাব, ২) অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, ৩) চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারা এবং ৪) পুত্র-কন্যার বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারা, স্পষ্টতই এই সমস্যাগুলি মূলত দারিদ্রজনিত, দারিদ্র দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া মানুষের কর্তব্য এই নীতি-ই তিনি প্রচার করেছেন, মানুষের সামাজিক অবস্থা স্বর্গস্থ মঙ্গলময়ের দুর্জয়ে বিধান, অতএব তা নতশিরে মেনে নেওয়া সাধুজনের কর্তব্য এই মত অক্ষয় দত্ত সমর্থন করেননি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে এদেশীয় সমাজ বিবাহ-সম্পর্কে উনার বক্তব্য নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক, বিবাহ পূর্ব প্রণয় সঞ্চার, বিবাহের পূর্ব শর্ত হওয়া উচিত। এই মতাদর্শ ঊনবিংশ শতকের আর কোনো বাঙালী মনীষী উল্লেখ করেছেন বলে দেখা যায় না। এখনো এই মত স্পষ্টত বিশ্বাস ও ব্যক্ত করতে পারেন এদেশে এমন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা সম্ভবত খুব বেশী নয়।

এছাড়া বাল্যবিবাহের অন্যান্য যেসব কুফল তিনি এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন তা তাঁর প্রাথমিক বিবৃতি), শরীর ও মনের অপরিণত অবস্থায় পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব, বিশেষত মেয়েদের জীবনে এই অকাল মাতৃত্ব যে অভিশাপ বহন করে আনে এদেশের বৃহত্তর সমাজে নারীজীবন আজও তা থেকে মুক্তি পায়নি।

বিবাহিত জীবনে দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম হওয়া উচিত? মূল প্রশ্ন সেটাই, এই প্রশ্নের উত্তর না পেলে কেবল বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরোধীতা সমাজচিন্তাবিদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, অক্ষয় দত্ত বলতে পেরেছিলেন সে, “স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্যাভাব থাকা উচিত, অতএব তাঁহাদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্যূনাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে”।

বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি শুধু নৈতিক বক্তব্যই রাখেননি, এটা বিশেষত উল্লেখযোগ্য যে তিনি অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যটির উল্লেখ করেন। সত্য এই যে, সাধারণভাবে মানবসমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা-সাম্য থাকে। কাজেই পুরুষের একাধিক বিবাহ ঘটলে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক নিয়মের লঙ্ঘন ঘটে। পুরুষের বহু বিবাহ অনগ্র সমাজে ধর্ম বৈষম্য ও সামাজিক মর্যাদা বোধের বহিঃপ্রকাশ।

বিবাহ তথা দাম্পত্য সম্পর্কের আলোচনায় আর যে দুটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা অক্ষয় দত্ত করেছেন তা হল বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা, আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বিষয় স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক সংযোগের অভাব লক্ষ্য করে, সেই সুস্থ সংযোগের প্রয়োজন উভয়েরই শিক্ষিত হবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেন। এই ব্যাপারে উদ্যোগী হবার জন্য তিনি শিক্ষিত যুবকদের আহ্বান জানান, মেয়েদের শিক্ষা কেবল সুষ্ঠুভাবে সন্তান পালনের জন্যে বা ভালোভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্যে প্রয়োজন এরকম কোনো সহজিয়া বক্তব্যকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। স্ত্রী বা পুরুষ যে-ই হোক, শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের আবশ্যিক শর্ত, এই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য।

অক্ষয় কুমার দত্তের বিশ্বদৃষ্টির কেন্দ্রমূলে ছিল জ্ঞানার্জনের গুরুত্ববোধ, সেই কারণেই শিক্ষাকে তিনি মানুষের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন বলে মনে করেছেন এবং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি কাজে শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত পনেরো বছর পর্যন্ত বালক বালিকাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, “ভাষা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-শিক্ষার উপায় মাত্র”, “গণিত ও লিপি বিদ্যাও প্রকৃত জ্ঞান নহে”, কারণ গণিত বিদ্যা “জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত আবশ্যিক”। লিপিবিদ্যা কেবল অর্জিত বিদ্যা, অন্যকে অবগত করাইবার নিমিত্ত... শিক্ষা করা কর্তব্য”।

অক্ষয় দত্ত শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত বালক বালিকা উভয়ের ক্ষেত্রে মানুষের শিক্ষাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখেছেন, তিনি বলেছেন, দুই বৎসর পর্যন্ত মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের থেকে শিশু অতঃপর দুই থেকে ছয় (২-৬) বৎসর পর্যন্ত এক ধরনের শিক্ষাগারে শিক্ষালাভ করতে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ছয় থেকে চৌদ্দ (৬-১৪) পর্যন্ত উচ্চতর বিদ্যাগারে পাঠ গ্রহণ করবে।

এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে তিনি মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে সকলের পক্ষে আবশ্যিক বলে মনে আলোচনা করেন, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান।

শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রণালী প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাখেন,

১) পাঠ্যগৃহ হবে প্রশস্ত ও পরিস্কৃত' যাতে শিশুদের শরীর সঞ্চালন সম্ভব হয় ও পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ রাখে, ২) বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে সুন্দর, যাতে ক্রীড়াভূমি সুপরিসৃত ও পরিপাটি ...প্রান্তভাগ সুন্দর সুন্দর পুষ্প বৃক্ষে সুশোভিত হয়, ৩) বিদ্যালয়ে যেন শিশুদের সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং সেই কারণে ছাত্র সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ হওয়া দরকার, ৪) বিদ্যালয়ে শিশুদের খেলাধুলোর অঙ্গ সঞ্চালিত হওয়া বল-বৃদ্ধির ...ব্যবস্থা থাকা দরকার, ৫) শিশুদের খেলা ধূলা (ক্রীড়া) ও মেলামেশা শিক্ষকদের হওয়া উচিত যাতে তারা প্রয়োজনমত শিশুদের সংশোধন করতে পারেন, ৬) শিক্ষক (শিক্ষাগুরু) সর্বদা শিশুর প্রতি 'স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য ও প্রসন্নতা' দেখাবেন। সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেই এই কথা বলেন তিনি। শিক্ষককে বলতে হবে যে, 'শিশুদের মনোবৃত্তি সতেজ' থাকবে কিন্তু তারা যেন অবাধ্য না হয়। ৭) জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার তাদের শেখাতে হবে।

অক্ষয় কুমার দত্ত রোমান্টিক আদর্শবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সহৃদয় মানবতাবাদী, তাই শিশুর প্রতি শিক্ষকের স্নেহ মনোভাব থাকা এবং শিশুকে সামাজিক ব্যবহার ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার, শিক্ষা দেবার বিষয় তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর উল্লিখিত নির্দেশগুলির প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে।

তিনি যে বিস্তৃত ও সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছিলেন তার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ কোথা থেকে আসবে এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য হলো, যে "রাজ্য তথা রাজশক্তি বা রাষ্ট্র যদি যুদ্ধের জন্য ব্যয় হ্রাস করে এবং ধনী সম্প্রদায় যদি নানা বিলাস ব্যসনে অপব্যয় হ্রাস করেন, তাহলে তাঁর বর্ণিত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার সহজেই বহন করা যাবে।

চিন্তানায়ক হিসাবে অক্ষয় কুমার দত্তের গুরুত্ব এইখানে যে, তিনি শুধু এ দেশের প্রথা বিশেষের তৎকালীন ভালোমন্দের বিচার করে ক্ষান্ত থাকেন নি,

নানা দেশে ও কালে মানুষের সামাজিক - আত্মীয়তা বন্ধনের সাধারণ ভিত্তি কি সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

যৌথ পরিবারের সমাজের পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে অক্ষয় দত্ত বিশেষভাবে বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের দায়িত্বের উপর জোর দেন, মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব স্বীকার করে, পরস্পরের শিক্ষায় সাহায্য করে, আন্তরিক বয়স্যভাবে রক্ষা করে যে পরিবার সন্তানের শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তাকে বড়ো করে তোলে- মনে হয়, অক্ষয় দত্তের বিচারে সেই পরিবারই আদর্শ।

তবু অক্ষয় দত্তের জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁকে যে সঙ্গীহারা একাকীত্বের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয় তা উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে এ দেশের মানস-মন্ডলের কথা চিন্তা করলে একপ্রকার অনিবার্য বলা যায়। বিচারহীন বিশ্বাস ও ভক্তি-বিহীনতা যখন মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান মানবসম্পদ বলে বিবেচিত হয়, তখন তিনি সারাজীবন নির্ধিকায় বিচারশীলতাকে সর্বাপেক্ষে স্থান দিয়ে এসেছেন, তিনি যে উপেক্ষিত হবেন এতে আর আশ্চর্য কি?

বাংলা ভাষায় যদি বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতো, বাঙালীর সমাজসংস্কার প্রেরণা ও রাজনৈতিক সাধনা যদি ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসে পরস্পর বিরুদ্ধ প্রেরণা হিসাবে দেখা না দিত, তাহলে অক্ষয় দত্ত সম্ভবত আজ এভাবে বিস্মৃত হতেন না। কিন্তু বর্তমানে যখন আমরা বিজ্ঞান সচেতন আধুনিক সংস্থাও নির্মাণে প্রয়াসী, বিবাহিত জীবনের রূপ যখন সনাতন ধারণার নিগড়, ভেঙে নতুন ও পরস্পর নির্ভরশীল বন্ধুত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই সম্ভব ও স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি পায়, তখন এই চিরকালীন আধুনিক ও বিজ্ঞান মনস্ক মনীষীর চিন্তা ও রচনা সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন থাকলে, তা আমাদের পক্ষে অবশ্যই অমার্জনীয় অপরাধ হবে।

তথ্যসূত্র : উনিশ শতকের বাংলায় সমাজচিন্তা, অজিত কুমার ভট্টাচার্য

শিক্ষা - বাস্তবমুখী ও কর্মমুখী

তপন কুমার দাস

শিক্ষা প্রক্রিয়ার কোনও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা, ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন।

বেশিরভাগ দেশেই নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সব শিশুদের পূর্ণ সময়ের শিক্ষা স্কুলে বা অন্যত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই কারণে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিস্তার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মিলিতভাবে ইউনেস্কো গণনা করে লক্ষ্য করেছে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও মানুষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার লাভ করবে যা মানব ইতিহাসে বিরল ঘটনা হবে। শিক্ষা নিয়ে নানা মূনি নানা মত দিয়েছেন। দার্শনিকগণ উল্লেখ করেছেন শিক্ষা মানুষকে বদলে দেয়। এই বদলে দেওয়ার ধারণা সম্পর্কিত সকলের বক্তব্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরেজ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ বেকন বলেছেন- শিক্ষার ফলস্বরূপ আমরা লাভ করি আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও দক্ষতা। এর প্রধান কাজ হল, বিনোদন যা আমরা একান্তে অবসরে পেয়ে থাকি। শিক্ষার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় আলাপ-আলোচনার সময়, বিচার-

বিশ্লেষণ ও অন্যান্য কাজকর্মে। তিনি আরও বলেছেন, শিক্ষিত মানুষরাই সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলাদাভাবে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখেন।

বেকন শিক্ষিত মানুষকে আলাদা চোখে দেখেছেন। বলেছেন, সুশিক্ষিতরাই কেবল পারে পরামর্শ দান করতে। যে কোন বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ও কাজের সফল ইতি টানতে। তিনি সুশিক্ষিত মানুষকে বিশাল বটগাছের সাথে তুলনা করেছেন-যার সুবিস্তৃত ডালপালার নীচে জনসাধারণ ছায়া গ্রহণ করে থাকে।

শিক্ষার এইসব মৌলিক ধারণার আলোকেই প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্ভব হয়েছে। বেকন বলেছেন বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে যেসব কার্য সম্পাদিত হয় যেমন শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা যে সব উদ্দেশ্য সাধিত হয় প্রায়োগিক অর্থে তাই শিক্ষা।

অন্যদিকে শিক্ষাবিদ ডিউই আবার শিক্ষাকে কেবল বিদ্যালয়ে কিংবা প্রতিষ্ঠানের গভিতে আবদ্ধ করতে রাজি নন। তিনি শিক্ষাকে পূর্ণ জীবনের বিকাশের অর্থে

ধরেছেন। সমাজ, পরিবেশ ও জীবনের প্রতিটি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা একটি অবিরাম গতিশীল প্রক্রিয়া যা কেবল বিদ্যালয় কিংবা প্রতিষ্ঠানেই শেষ হয়ে যায় না।

বর্তমানে শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-চেতনার অবক্ষয় ঘটেছে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মানুষকে এখন অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অত্যাধিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। আমাদের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি বাইরের মানুষ, সমাজ সংস্কৃতি এবং পরিবেশ থেকেও সমভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের সবসময় চিন্তার দুয়ার উন্মুক্ত রেখে অনুসন্ধিৎসু জীবন যাপন করতে হবে।

আবার শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করতে বেকন একটি মজাদার অথচ অতি বাস্তব উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, পড়াশুনার অত্যাধিক সময় ব্যয় করাটা অলসতার লক্ষণ। বেকনের এ কথার মূল অর্থ হল — যারা কেবল পাঠ্যবই থেকে বিদ্যা অর্জনের মুখাপেক্ষী হয় তারা সুশিক্ষিত হতে পারে না। পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং নিজের অর্জিত শিক্ষা ও বুদ্ধির আলোকে সমাজে অবদান রাখতে হবে।

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য এবং মা-বাবার কাছে সন্তানের শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যের সাথে একটি মিল পাওয়া যায় তা হল বাহ্যিক পরিবর্তন। যেখানে মানবিক পরিবর্তন অনুপস্থিত।

এই যদি শিক্ষার অবস্থা হয় তাহলে দেশ ও জাতি ছাত্র সমাজের কাছে কি আশা করতে পারে? আমরা দেখেছি। শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে একটা কাজের আশায় থাকে। কর্মস্থলে যোগদান করতে না পেরে তারা জীবনে হতাশ হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন করা যায়, তাহলে কি কোনও রাস্তা নেই। হ্যাঁ, আছে। শিক্ষাকে হতে হবে বাস্তবমুখী - যা প্রত্যেক মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, ভাবতে শেখায়। প্রতি মানুষের মধ্যেই থাকে জ্ঞানের আলো। তার সেই আলোকে শিক্ষার মাধ্যমে জাগাতে হবে।

কিন্তু বাস্তবমুখী শিক্ষার উৎসই বা কোথায়? কিভাবে আমরা তা অর্জন করতে পারি? উত্তরে বলা যায় বাস্তবমুখী শিক্ষার প্রধান উৎস হল পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভাল বই ও সংস্কৃতি। একজন ব্যক্তির বাস্তবমুখী শিক্ষা অর্জনে মুখ্য ভূমিকা থাকে তার পরিবারের, কেননা পরিবারের মধ্যে কোনও মানব শিশু শিক্ষা পেয়ে থাকে। তার জীবনের সকল প্রতিকূলতা জয় করে সফলতা অর্জন করতে পারি। তাই শিশুর অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। যেন তাঁদের সন্তান ভাল নম্বর তোলা নয়, ভালো মানুষ হিসাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ ছাড়া ভাল বই ও সংস্কৃতিও প্রয়োজন থাকে এই ক্ষেত্রে।

অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থী ১৮/১৯ বছর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মস্থলে প্রবেশ না করতে পারলে সেই শিক্ষার কোনও মূল্য থাকে না। বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয় কর্মমুখী। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হলে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে কর্মমুখী শিক্ষার উপর। এ ক্ষেত্রে চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন্স ইত্যাদি দেশগুলিকে ‘আদর্শ’ হিসাবে ধরতে পারি।

আমাদের দেশে শিক্ষা জীবনে প্রবেশের শুরু থেকে একজন শিক্ষার্থীকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে যখন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরেই একে অন্যের ‘সঙ্গে’ প্রতিযোগিতায় ভারসাম্যহীন মানসিকতা গড়ে ওঠে। ফলে তার সহপাঠী একজন মানুষ না হয়ে তার কাছে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবের কারণে শিক্ষার মাধ্যমে

শিক্ষার্থীর যে প্রকৃত বিকাশ ঘটানো কথা ছিল তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর দীর্ঘমেয়াদী পরিণতিতে একজন শিক্ষার্থীদের প্রতি মানসিক ও সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে না। বরং সংকীর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমষ্টিগত মনোভাবের সমন্বয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও গোষ্ঠী স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য পায়। কাজেই প্রাথমিক স্তরে কোনো ধরনের পরীক্ষা না রেখে মূল্যায়ন করা যায় সে বিষয়টি নিয়ে ভাবা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এখন খুবই প্রয়োজন। শিক্ষা জীবনের শুরুতে প্রাথমিক স্তর থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক তথা হাতে কলমে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সেই শিক্ষা যেন কাজে লাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে আনন্দ থাকে। তাঁর মতে জীবন যেমন হওয়া উচিত শিক্ষাও তেমন হওয়া উচিত। জীবন ও শিক্ষা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাই জীবনে চাহিদা মেটাতে যে শিক্ষা সফল সেই শিক্ষা দরকার। আলবার্ট আইনস্টাইন বলতেন জ্ঞানের চেয়ে বড় কল্পনা শক্তি। তাঁর এইরকম বলার একটা কারণ আছে। কারণটি হল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু কল্পনা শক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। মানুষ কল্পনা শক্তি নিয়ে জন্মায়, সেই অমূল্য শক্তিকে খুব যত্ন করে লালন পালন করতে হয়। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। পৃথিবীতে মহান কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে কল্পনা শক্তির কল্যাণে।

কর্মমুখী ও ব্যবহারিক শিক্ষার শক্তিই হচ্ছে উন্নয়ন ও জাতি গঠনের আসল শিক্ষা। জাতীয় জীবনে অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি শিক্ষা। হাতে কলমে শিক্ষাই হচ্ছে একটা জাতির উন্নতির চাবিকাঠি। ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে পারে না। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। তাই দিন দিন শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বাড়ছে। এ সমস্যার মোকাবিলা করতে কর্মমুখী শিক্ষা চালু করা খুবই প্রয়োজন। কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব বহুবিধ। এ শিক্ষা গ্রহণের পর একজন শিক্ষার্থীকে চাকরির জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। এ শিক্ষা বেকারত্বের অভিষাপ থেকে দেশকে মুক্ত করে। দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও দারিদ্র মোচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে কারিগরি শিক্ষা। ব্যবহারিক শিক্ষা রুটি রোজগারের পথ খুলে দিয়ে বেকার সমস্যা সমাধান করে।



আদর্শ বিদ্যালয়ের সন্ধান

চীন দেশের একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, “আমি পড়ি আমি ভুলে যাই, আমি দেখি আমি মনে রাখি, আমি করি তো আমি বুঝি”। দীর্ঘদিন লালিত মুখস্ত বিদ্যার প্রচলিত সংস্কৃতিতে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার সংস্কৃতি কার্যকর করতে গেলে শিক্ষকসহ সকলকেই একটু পরিশ্রম করতে হবে। শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হবে। তবেই নতুন নতুন পদ্ধতি ও শিক্ষার বিকাশ হবে।

রষ্টেসংঘের শিক্ষা-বিষয়ক সংস্থা UNESCO একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার ভিত্তি কী হবে তা নির্দিষ্ট করতে জ্যাক ডেলোর-এর সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করে। ১৯৯৬ সালে ‘ডেলোরস্ কমিশন’-এর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। 'Learning: The Trerasure within' - শীর্ষক এর প্রতিবেদনে বলা হয়ে, '... the commission felt that education throughout life is based upon four pillars :
Learning to know,
Learning to do,
Learning to live together
and learning to be.'

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ - এ বলা হয়েছে, শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য হল - শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত করা এবং শিশুর মধ্যে সেই জীবনরোধ গড়ে তোলা যা অন্যকেও একই সম্ভাবনায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে। এই রূপরেখায় শিশু কেন্দ্রীক শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, “শিশুদের অভিজ্ঞতা, তাদের বক্তব্য এবং শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে শিক্ষা সম্পন্ন হয় তাকেই বলে শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা”।

পাঠ্য বই -এর ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ে শিশুর মেধা নির্ধারণের পদ্ধতি সবার আগে বদলানো দরকার। যতক্ষণ না এইরকম পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা শিশুর কাছে আনন্দদায়ক হবে না। আমরা শিশুর মধ্যকার সম্ভাবনা, সৃষ্টিশীলতা এবং গঠনমূলক সামর্থ্যের উপর ভরসা করতে পারি না, তাই শিশুকে জোর করে শেখাতে চাই। নতুন নতুন বিষয় পাঠ্যসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ফলে পাঠ্যপুস্তকের আয়তন বাড়ছে বছর বছর। আর শিশুর উপর চাপ বাড়ছে। বিদ্যালয়কে শিশুবান্ধব এবং শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক করতে শিক্ষা অধিকার আইন আমাদের সাহায্য করতে পারে।

বিনাব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ - এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধারা ২৯ নং ধারা।

ধারা ২৯ -১) সংশ্লিষ্ট সরকারের বিজ্ঞাপিত অনুযায়ী গঠিত শিক্ষা কর্তৃপক্ষ

বুনিয়াদি (১ম ৮ম শ্রেণি) শিক্ষার পাঠ্যক্রম এ মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেবেন।

২) উপধারা (১) অনুযায়ী পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করার সময়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন-

- এ) সংবিধানের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা
- বি) শিশুর সার্বিক বিকাশ
- সি) শিশুর জ্ঞান, সম্ভাবনা এবং প্রতিভার নির্মাণ
- ডি) দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ
- ই) কাজের মধ্যে দিয়ে শেখা, শিশু কেন্দ্রিক এবং শিশু বান্ধব পদ্ধতিতে আবিষ্কার ও অন্বেষণ করা
- এফ) শিক্ষার মাধ্যম হবে (যতটা সম্ভব) শিশুর মাতৃভাষা,
- জি) শিশুটিকে ভয়, আতঙ্ক বা উদ্বেগ মুক্ত রেখে স্বাভাবিকভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে সাহায্য করা
- এইচ) শিশুর কোনো বিষয়কে বোঝা এবং তাকে কাজে লাগানোর সক্ষমতার সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন।

বলা বাহুল্য, ২৯ নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব অপরিসীম। অভিভাবকদের দায়িত্বও কম নয়। বরং বলা ভাল বিদ্যালয়কে অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা যদি নিজেদের মনে করে এগিয়ে আসে, তবেই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং শিশুর গুণমানের শিক্ষা কার্যকর হতে পারে। গড়ে উঠতে পারে আদর্শ বিদ্যালয়।

মুনাফালোভী কর্পোরেট শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে দেখে এবং শিক্ষাকে বেসরকারি করার স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে সরকারি বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সমাজের বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছে। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের সম্ভাবনাদের বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করছে। বহু সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও বিদ্যালয় বন্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অথচ, আমাদের রাজ্যে বহু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষক এবং অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা মিলিতভাবে বিদ্যালয় পরিকাঠামোর উন্নতি ও শিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশ ঘটচ্ছেন। চেষ্টা করছেন এবং নিজেদের শ্রম, অর্থ ও মেধা দিয়ে গড়ে তুলছেন প্রকৃত অর্থে শিশুবান্ধব ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবেশ। যে সকল বিদ্যালয়কে আমরা আদর্শ বিদ্যালয় বলতেই পারি। এই বিদ্যালয়গুলি অন্যদের কাছে হতে পারে উদাহরণ।



ট্যাংরামারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ



গিরিবালা আদর্শ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা